ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 39-46
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.267

আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্দরমহল

ড. আঞ্জুমান লিপি, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কালিয়াচক কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the field of Bengali fiction, Abu Bashar stands out as one of the foremost writers whose works present a comprehensive portrayal of the inner quarters of Bengali Muslim society. Centering his narratives on issues such as divorce, polygamy, child marriage, unequal marriages, and halala marriage, he courageously exposes the harsh realities of female oppression carried out under the shelter of religion within the Muslim patriarchal domestic sphere. This bold representation is undoubtedly worthy of appreciation.

The women inhabiting the inner worlds of Abu Bashar's fiction—Zahida, Madina, Rabeya, Kulsum, Shirin, Nabina, or Rajia—are ultimately compelled to disappear within the narrow and complex entanglements of society and religious law. Whether educated or uneducated, affluent or impoverished, women across all strata of the inner household in Abu Bashar's works are subjected to inhuman suffering and relentless anguish.

In the short story Simar, eleven-year-old Zahida is forced to meet the physical demands of eighteen-year-old Sukhabas and dies on the very night of her marriage. In the short story Nastik, the educated Rabeya is likewise driven into darkness due to the religious fanaticism, recklessness, atheism, and misplaced loyalty to friendship displayed by Hamidul and Mamun. On the other hand, in Ek Tukro Chithi (A Fragment of a Letter), even after offering Shirin a glimpse of an enlightened path, the author ultimately pushes her toward a terrifying fate, defeated by religion, wealth, society, politics, power, and inhuman cruelty.

Akhtar Haji, a representative of a patriarchal society obsessed with polygamy, cunningly marries the beautiful and intelligent adolescent Shirin in exchange for five bighas of land and a house in the city. From that moment, all harmony and rhythm vanish from Shirin's life. In the novel Phulbou, despite being educated, progressive, and mature, Rajia and Millat find their union obstructed by religion, society, and entrenched customs, as Millat is Rajia's stepson. The religious decrees and interpretations of the Qur'an and Hadith offered by Akbar Maulavi, the self-proclaimed guardian of religion, overpower Riyaz, Rajia, and Millat through the authority of religious zealots. The resistant and progressive educated individuals in this novel are ultimately defeated by the rigid and uncompromising dictates of society and religion.

Through these dark narratives of the Muslim inner household, Abu Bashar's social vision leaves us profoundly speechless.

Keywords: Muslim inner household, Qur'an–Hadith, religious fanaticism, divorce, halala marriage, polygamy, women's tragic life and suffering

বাঙালি মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থান লক্ষ করলে দেখা যায়, ব্রিটিশভারতে ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তারা বর্ণশ্রেষ্ঠদের তুলনায় প্রায় একশো বছর পিছিয়ে পড়ে। খুব ধীরগতিতে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষার প্রতি তারা এগিয়ে আসে। উপরন্তু দেশভাগে তথাকথিত শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক ও অর্থশালী মুসলিম জনসমাজ পূর্ব পাকিস্তান চলে যায়। এদেশে পড়ে থাকে মূলত অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ, দরিদ্র ও গ্রামীণ অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম জনসমাজ, প্রায় ব্রাত্য হয়ে। বেশিরভাগ বর্ণশ্রেষ্ঠদের চোখে যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শ্রমজীবী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সাম্প্রদায়িক, অপরাধপ্রবণ এবং অপর। বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে তাদের এই রূপই প্রকাশিত। বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা হয় মূলত প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৯৫৮) দিয়ে। 'আলালের ঘরের দুলাল'এ আমরা ঠকচাচা ও ঠকচাচিও এর ব্যতিক্রম নয়। শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আমরা যে সমস্ত মুসলিম নর-নারীর পরিচয় পাই, তারা প্রায় সকলেই পাঠকের মনে পক্ষান্তরে মুসলিম বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। তাছাড়া ঠকচাচা থেকে শুরু করে জেবউন্নিসা পর্যন্ত যে সমস্ত চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তারা কেউই বাঙালি মুসলিম জনসমাজের সার্বিক প্রতিনিধিত্ব করে না। ফলে বাঙালি জনসমাজের একটি বৃহত্তর অংশই তখন থাকে অন্ধকারে।

প্রকৃতপক্ষে কথাসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায়, আলালের ঠকচাচি অনেকটা বাস্তবানুগ নারীচরিত্র হলেও, ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'এর রাজকন্যা জহীরা ও রোশেনারার জীবন-দর্শন ও চাওয়া-পাওয়া সাধারণ মুসলিম নারীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একই কথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনীর' আয়েষা, 'কপালকুণ্ডলা'র মতিবিবি, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দলনিবেগম ও 'রাজসিংহ'এর জেবউন্নিসা-দরিয়া বিবি প্রসঙ্গেও বলা যায়। বাঙালি মুসলিম নারীর অন্দরমহলের সমস্যা ও সংকটের কথা, এইসমস্ত ঐতিহাসিক রোমান্সপ্রধান অসাধারণ নায়িকার জীবনের সঙ্গে মেলে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দালিয়া' ছোটগল্পের আমিনা ও 'দুরাশা' ছোটগল্পে বদ্রাউনের নবাব, গোলাম কাদের খানের কন্যার মধ্য দিয়ে যে দুজন মুসলিম নারীর জীবনের চালচিত্র খুঁজে পায়, তাতে লেখকের মূল প্রতিপাদ্য ভিন্নধর্মী। 'মুসলমানির গল্পে' হাবিব খাঁর আশ্রিতা কমলার মানসিক পরিবর্তনকে রূপায়িত করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' ছোটগল্পের আমেনার জীবনের যে সমস্যা ও সংকটের কথা লেখক বলেছেন, তাতে প্রাধান্য পেয়েছে হিন্দুপ্রধান গ্রামের জমিদার ও পূজারি তর্করত্নের দাপটের কাছে হেরে যাওয়া দরিদ্র চাষি গফুরের কথা। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বে শাহজীর স্ত্রী অন্নদার জীবনযন্ত্রণার কথা আছে, যে মুসলমান বেদিনির জীবনযাপন করলেও, শাঁখাসিঁদুর ও নোয়া পরে, নিষ্ঠা সহকারে হিন্দুসংস্কার পালন করে। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি' ও 'নারী ও নাগিনী' গল্পদুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কিন্তু লেখক এখানে তারিণী মাঝি ও খোঁড়া শেখের মধ্য দিয়ে, মুসলিম জনসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থানের বাস্তবতাকে রূপায়িত করলেও, সুখী ও জোবেদার মধ্য দিয়ে মূলত জৈব ধর্ম বা জৈব আসক্তির মত মানবজীবনের আদিম প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের তমরেজের সদ্যবিধবা স্ত্রীর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, অন্নদারায়ের মত মহাজনের সুদের কারবারে বন্দী দরিদ্র কৃষকপত্নীর চরম আর্থিক সংকটের কথা। বনফুলের 'তাজমহল' ছোটগল্পে ফকির শাজাহানের 'ক্যাংক্রাম অরিস' রোগাক্রান্ত স্ত্রীর জীবন-মৃত্যুর লড়ায়ের মধ্য দিয়ে লেখক, মূলত স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসার এক অপূর্ব আলেখ্য রচনা করেছেন। যেখানে স্ত্রীর প্রতি ফকির শাজাহানের প্রেম, নিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতার কাছে, সম্রাট শাজাহানের তাজমহল অনেকটা ম্লান হয়ে যায়। সমরেশ বসুর 'আদাব' ছোটগল্পে প্রাক স্বাধীনতালগ্নে যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মধ্যে সম্প্রীতির আবহ রচিত, সেখানে মুসলিম মাঝির ইদের আগের

রাতে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, 'পরবের দিন' তার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের রক্তরাঙা চোখের জলের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে সুতা-মজুরের বিহ্বল দৃষ্টিতে।

তবে বেশকিছু কথাসাহিত্যিকের রচনায় মুসলিম অন্দরমহল উঠে এসেছে তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়েই। এইপ্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর 'রূপজালাল' (১৮৭৬) ও বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসদুটোতে মুসলিম নারীর লেখনীতে, মুসলিম অন্দমহলের সমস্যা ও সংকট উঠে এসেছে। এখানে তালাক ও বহুবিবাহে জর্জরিত মুসলিম অন্দমহলের যে যন্ত্রণাময় জীবনের বাস্তবতা ধরা পড়েছে, তা বাংলা কথাসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তিনটি পর্বে বিভক্ত (মহরম পর্ব- ১৮৮৫, উদ্ধার পর্ব- ১৮৮৭ ও এজিদবধ পর্ব– ১৮৯০) এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু সুদূর আরবের প্রেক্ষাপটে রচিত হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের বিরোধ তথা কারবালার প্রান্তে সংঘটিত যুদ্ধের করুণ পরিণতি হলেও, এর কাহিনি অংশে বর্ণিত বহুবিবাহের ভয়ানক বাস্তবতার মধ্যে ধরা পড়েছে মুসলিম অন্দরমহলের এক অন্ধকারময় জগৎ। জায়েদা ও জয়নব সুদূর আরবের বাসিন্দা হয়েও, বহুবিবাহ ও তালাকজর্জরিত মুসলিম অন্দরমহলের অভিশপ্ত জীবনের প্রতিনিধিত্বে, দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে বিদ্রোহী কবি রূপে সমধিক পরিচিত হলেও, তিনি 'বাঁধনহারা' (১৯২৭), 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০) ও 'কুহেলিকা' (১৯৩১) নামে তিনটি উপন্যাস এবং বেশকিছু ছোটোগল্পও লিখেছেন। নজরুল ইসলামের এই তিনটি উপন্যাসের কাহিনি অংশ জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে মুসলিম জনসমাজ। কিন্তু মুসলিম অন্দরমহলের যে চিত্র তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, তার বাস্তব ভিত্তি সংখ্যালঘুদের জীবনের সঙ্গে অনেকটাই বেমানান। আব্দুল আযীয আল আমানের 'শাহানী একটি মেয়ের নাম' (১৯৬০) উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক তাঁর এই উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র, পশ্চাদপদ, অশিক্ষিত মুসলিম জনসমাজের একটি বাস্তবসম্মত চিত্রকে রূপায়িত করেছেন। যে জনসমাজ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, চোখ বন্ধ করে ধর্মগুরু মোল্লা ও মৌলবিদের বলা প্রথাবদ্ধ পথকেই অনুসরণ করে চলে। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' ছোটগল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে শরিয়তের বিধিকে অপব্যবহার করে, মিথ্যা অপবাদে মাজু খাতুনকে তালাক দিয়ে, মোতালেফ নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে। সামান্য কিছু কিছু কথার আঁচড়ে ধরা পড়ে মুসলিম অন্দরমহলে প্রচলিত বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদে জর্জরিত নারীর দাম্পত্যজীবনের ঠুনকো নিরাপত্তার কথা। গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' (১৯৮১) উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে মূলত ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে ভারতবর্ষের যে বৃহত্তর রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে এক মহাকাব্যিক কলেবরে তুলে ধরেছেন লেখক, তাতে তৎকালীন মুসলিম অন্দরমহলের আর্থসামাজিক অবস্থানটিও সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। সৈয়দ মোস্তফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮) উপন্যাসে একাধারে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মীয় রীতিনীতি তথা সমাজতত্ত্বের নানান দিক মহাকাব্যিক বিশালতায় ধরা পড়েছে। একই ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় আচার-আচরণের ভিন্নতা থেকেও যে বিরোধিতার সূত্রপাত হয়, তার এক বাস্তবসম্মত রূপও লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

তবে মহাস্বেতা দেবির 'তালাক' ছোটগল্পটি বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 'তালাকঃ উচ্চারণের রকমফের নিয়েই মুফতিদের বিরোধ' প্রবন্ধে লেখক আফসার আমেদ বলেছেন,

> "দাম্পত্যের ভিতর নিত্যনতুন নানা সমস্যা এসে পড়ে, তা কখনো রোষের বশবর্তী করে পুরুষটিকে। এটা বাস্তব সত্য। যেমন ক্ষিপ্ত পুরুষ স্ত্রীকে গালি দিতে গিয়ে খুব আহত করে

এমন গালি পর্যন্ত দিয়ে ফেলে। তেমনি 'তালাক' উচ্চারণের একটি সমধর্মী প্রবণতা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। সাধারণ্যে এমত তালাক দেওয়ার দৃষ্টান্ত সবচেয়ে বেশি। তার পরিণতি হয় মারাত্মক। পুরুষটির রাগ পড়ার পর আর কিছু করার থাকে না। স্ত্রীকে চলে যেতে হয় তার স্বামী সন্তান সংসার ছেড়ে। স্বামী তার ভুল বুঝতে পারার পরও পরিণতি এমনই ট্রাজেডির দিকে বাধ্যত যায়। অনেক সময় এমন বিবাহ বিছিন্ন স্বামী-স্ত্রী পুনরায় দাম্পত্য ফিরে পাবার জন্য যে ধর্মীয় পন্থার আশ্রয় নিয়ে থাকে তা খুব একটা গৌরবজনক নয়। বিগত স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে হয়, সেই পুরুষটিকে দিয়ে নারীটিকে আবার তালাক দেওয়াতে হয়, তারপর পূর্বস্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারে নারীটিকে। এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।"[১]

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) 'তালাক' ছোটগল্পে উক্ত সামাজিক সমস্যাকে রূপায়িত করেও, এক ভিন্নতর ও সম্মানীয় পথের সন্ধান দিয়েছেন, তালাকপ্রাপ্ত কুলসমের অসাধারণ মানসিকতার জায়গা থেকে। কুলসম ও আসগরের সুখী দাম্পত্য জীবনে একমাত্র বংশধরের চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। মতবিরোধের চরম পর্যায়ে আসগর রোষের বশবর্তী হয়ে, কুলসমকে তালাক দিয়ে বসে। আসগরের সংসারে তালাকপ্রাপ্ত কুলসমের আর কোন অধিকার থাকে না। তিল তিল করে গড়ে তোলা সংসারে যা কছু অর্থ, সোনা ও রূপা সে জমিয়েছিল, তার সব কিছু নিয়েই কুলসম অভিমানে ঘর ছাড়ে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে, আসগর ট্রাজেডির নায়কে পরিণত হয়। যেকোনো উপায়ে কুলসমকে ফিরে পেতে মরিয়া হয় সে। কিন্তু আসগরের দাম্পত্যে ফিরে যাওয়ার কদর্য পথ 'হালালা' বিয়ে কুলসম মেনে নিতে পারে না। অথচ ভালোবাসার মানুষ আসগরের সঙ্গে বসবাসের অভ্যেসও সে ত্যাগ করতে পারে না। তাই সমস্ত সামাজিক সমালোচনা, নিন্দা, ধর্মীয় বিধান ও পাপের ভয়কে উপেক্ষা করে সে, আসগরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছাড়ে। কারণ হিসেবে সে আসগরকে দৃঢ়স্বরে বলে, "মোরে হেঁপো উগী এরফানের ঘরে ঠেলছিলে, ই তা হতে ভাল নয়?"[২] তবে ধর্মীয় বিধানকে সে পুরোপুরি অগ্রাহ্যও করে না। সে তাই আসগরের সঙ্গে বসবাস করেও, একটা দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্তে অটল। আর এখানেই কুলসম সেই সমাজ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি আধুনিক হয়ে ওঠে। যে সমাজ বারবার ধর্ম ও পাপের ভয় দেখিয়ে নারীর সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে খেলা করে, কুলসম তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে সেই সমাজের প্রচলিত আইনকে আমান্য করার দুঃসাহস দেখায়। আর্থিক স্বাবলম্বন নারীকে শক্তি ও সাহস যোগায় বলেই লেখিকা কুলসমকে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করেন। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রতিবাদী কুলসমের মধ্য দিয়ে, মুসলিম অন্দরমহলে এক প্রভাতরশ্মির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তবে যে সমস্ত কথাকারদের সাহিত্যে মুসলিম অন্দরমহলের বৈচিত্র্যময় আখ্যান তার সার্বিক পরিচয় নিয়ে উঠে এসেছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আফসার আমেদ, আবুল বাশার ও আনসারউদ্দিন। আমাদের আলোচ্য আবুল বাশার। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে তালাক, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অসমবিবাহ ও 'হালালা বিবাহ'কে কেন্দ্র করে, মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক অন্দরমহলে ধর্মের আশ্রয়ে নারীহননের যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার সাহস দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। মহাশ্বেতা দেবীর 'তালাক' ছোটগল্পের কুলসম নিজের মতো করে বাঁচার একটা পথ খুঁজে বার করলেও, আবুল বাশারের জাহেদা, মদিনা, রাবেয়া, কুলসম, শিরিন, নবীনা বা রাজিয়া শেষপর্যন্ত সমাজ ও ধর্মীয় আইনের সংকীর্ণ জটিলতায় হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত সবধরনের সমাজেই, আবুল বাশারের নারীরা জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় না।

আবুল বাশারের 'সিমার' ছোটগল্পে এগারো বছরের জাহিদাকে, আঠারো বছরের যুবক সুখবাসের শারীরিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে, বিয়ের রাতেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। বুকে লোমহীন সুখবাসের এই অমানবিক নিষ্ঠুরতায়,

সিমার নামটি যেন সার্থকতা লাভ করে। পিতা গিয়াসের চাকরির নিরাপত্তা ও ধর্মীয় নির্দেশ পালনেই জাহিদাকে অকালে ঝরে পড়তে হয়,

> "মা জাহেদা, সুখবাসই তোমার সব মা। ইহকাল পরকালের সাথী। সুখদুঃখের শরীক। স্বামীর কথা কখনো অমান্য কোরো না। যখন যা চাইবে, সাথে সাথে পালন করবে। যত কষ্টই হোক, কোনো কিছুতেই না বলবে না। (হাদিসে আছে উটের পিঠে যেতে যেতে স্বামীর যদি কামনা জাগে, স্ত্রী তা সেই উটের পিঠেই নিবৃত্ত করবে।) কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না গিয়াসজী। আটকে গেল। কেননা জাহেদার এখনো স্ফুট পূর্ণিমা আসে নি। হায়েজ (মাসিক ঋতুস্রাব) হয়নি। কাঁচা নরম গা। হাড়গুলো পুরোপুরি শক্ত হয়নি।"[৩]

সিমারের দ্বিতীয় স্ত্রী মদিনাকে বিনা অপরাধে তালাক পেতে হয়। যে মদিনার গরিব পিতা শুধুমাত্র একটু আশ্রয় ও সামান্য ভাতের আশায় সুখবাসের মত মানুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়, তালাকপ্রাপ্ত মদিনার জীবন সেদিক থেকে আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়ে। তাই সুখবাসকে ভালবেসে, সুখবাসের আশ্রয়ে থাকার জন্যই সে ধর্ম নির্ধারিত 'হালালা বিবাহে' রাজী হতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও ষড়যন্ত্রের শিকার মদিনার আর কাঙ্ক্ষিত আশ্রয়ে ফেরা হয় না। সে স্রোতের টানে এক আশ্রয় থেকে আর এক আশ্রয়ে ভেসে যেতে বাধ্য হয় নিজের স্বপ্ন ও ইচ্ছের বিরুদ্ধে। কোরান ও হাদিসের আয়াত তার জীবনে তখন আর শান্তি ও স্বস্তি নয়, নিরন্তর এক কান্নার সুর বয়ে আনে। সমাজ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ লেখক আবুল বাশার জাহেদা ও মদিনার জীবনের মধ্য দিয়ে, মুসলিম অন্দরমহলের এক মর্মান্তিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন।

লেখকের 'নাস্তিক' ছোটগল্পের শিক্ষিতা রাবেয়াও শেষপর্যন্ত অন্ধকারে চলে যায়। উচ্চবিত্ত পরিবারের পুত্রবধূ রাবেয়াকে, হামিদুল রোষের বশবর্তী হয়েই তালাক দেয়। কিন্তু ভালবাসার মানুষকে হারিয়ে উদভ্রান্ত হামিদুল, রাবেয়াকে পুনরায় ফিয়ে পেতেই, একসময়ের বন্ধু মামুনের সঙ্গে 'হালালা বিয়ে'র ব্যবস্থা করে তিনমাসের জন্য। বন্ধু হামিদুলের ঋণ শোধ করার জন্য ও রাবেয়ার প্রতি দুর্বলতা থেকেই উচ্চশিক্ষিত, তালাকবিরোধী, প্রগতিশীল নাস্তিক অধ্যাপক, এই নিষ্ঠুর অমানবিক হালালা বিয়েতে রাজি হয়। হামিদুলের চেয়ে, মামুন রাবেয়ার অনেক বেশি প্রিয় মানুষ। এই প্রিয় মানুষের সঙ্গে আজীবন সংসার করার আকুলতা, তার সন্তানের জননী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বারবার প্রকাশ করেও, রাবেয়া নিজের মতো করে বাঁচার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বন্ধুর প্রতি সততায় মামুন একসময়ের প্রেমিকা রাবেয়াকে তালাক দেয়। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করা রাবেয়া এই ভাবেই দুজন পুরুষের হাতে যন্ত্রণাদগ্ধ হতে থাকে। চরম অবমাননা, দুশ্চিন্তা ও 'স্নায়বিক উত্তেজনা' থেকে সে এক একসময় জ্বরগ্রস্ত হয়ে পড়ে, প্রলাপ বকে। রাবেয়ার সমস্ত যুক্তি, তর্ক ও প্রতিবাদ একসময় মামুনের কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়। মামুন তাকে গোঁড়া ও হঠকারী হামিদুলের কাছে ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এখানে এসে মামুন নাস্তিক থেকে যেন মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু রাবেয়া জানে, মামুন তাকে স্পর্শ না করলেও, তাদের এই যাপনের সন্দেহ ও আঘাতে বারবার হামিদুল তার জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলবে। তাই লেখক রাবেয়ার মধ্য দিয়ে, হালালা বিয়েতে বাধ্য নারীর অন্দরমহলের এক নিষ্ঠুর সত্যকে এইভাবে তুলে ধরেছেন,

> "হামিদুলও আমায় চিরকাল সন্দেহ করবে। তুমি ওকে চেন না। তোমার চরিত্রের পবিত্রতা একটা ঠুনকো সেন্টিমেন্ট। মানুষের কাছে তার কোনোই দাম নেই। ... –কেন তবে তুমি আমায় বিয়ে করলে, বিয়ের সময় তোমার বিবেক কি লোভমুক্ত ছিল? আমাকে তুমি সাত দিন বাদে ফিরিয়ে দেবে, তখন আমার কী হবে? হামিদুল বিশ্বাস করবে না। ফের সে আমায় তালাক দেবে, তখন কী হবে, বল?"[৪]

অথচ এই ভয় নিয়েই রাবেয়া হামিদুলের সংসারে ফিরে যেতে বাধ্য হয় ইদ্দতকাল পেরিয়ে। লেখক রাবেয়ার জীবনের অন্য কোনো আলোকময় পথ নির্দেশ না করে, তাকে শেষপর্যন্ত বোরখায় আবৃত অন্ধকারের প্রাণী করে তোলেন।

অন্যদিকে লেখক 'এক টুকরো চিঠি'র শিরিনকে আলোকময় পথের সন্ধান দিয়েও ধর্ম, অর্থ, সমাজ, রাজনীতি, প্রতিপত্তি ও অমানবিক নিষ্ঠুরতার কাছে হারিয়ে, চরম ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেন। বহুবিবাহে আসক্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি আখতার হাজী পাঁচ বিঘে জমি ও শহরের একটি বাড়ির বিনিময়ে, সুন্দরী ও মেধাবী কিশোরী শিরিনকে কৌশলে বিয়ে করে। তারপরেই শিরিনের জীবনের সমস্ত সুর ও ছন্দ হারিয়ে যায়। বুড়ো হাজীর স্পর্শে ভীত-সন্ত্রস্ত শিরিনের মর্মান্তিক জীবনের চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন হাজীসাহেবের কন্যা মিনুর মধ্য দিয়ে,

> "বাবা যেদিন শিরিনের ঘরে ঢুকতেন তাহাজুদের নামাজশেষে, সে রাত ছিল অত্যন্ত পাশবিক। শিরিন কাঁদতেন। মনে হত, শিরিনের গায়ে জোর করে কে যেন সুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। এক ধরণের বোবা কান্না শোনা যেত। ধর্ষণের সময় মেয়েরা বোধহয় এমনি করে কাঁদে। মাঝে-মাঝে পশুর মতন গোঁঙাতেন শিরিন। মা কেবল কপালে করাঘাত করে বলতেন—মেয়েটাকে শেষকরে দিলে হাজী। মেরে ফেললে গো।"[৫]

শুধু তাই নয় শিরিনের জীবনের সমস্ত সাধ ও স্বাধীনতা হাজীর শাসনে হারিয়ে যায়। বাঙালি সাজসজ্জায় অভ্যস্ত শিরিনকে বোরখা পড়তে বাধ্য করা হয়। মাঝে মাঝেই হাজীসাহেবের মুসলিমলীগ অতিথিদের জন্য সারারাত জেগে চা ও খাবার যোগান দিতে গিয়ে ক্লান্ত শিরিনকে বারবার "বোরখা খুলতে হয়, আর পরতে হয়। শিরিন দম বন্ধ করে কেবলই বলেন, মাই লাইফ ইজ হেল। জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।"[৬] এই জাহান্নামের আগুন থেকে পালাতেই শিরিন একসময় আত্মহত্যার চেষ্টা করে। হাজীর চেষ্টায় সে প্রাণে বাঁচলেও, তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। সেও জীবনের সমস্ত স্বপ্ন ও হাসি হারিয়ে নিষ্প্রাণ পুতুল হয়ে ওঠে। কিন্তু কুলসমের দূরসম্পর্কের ভাই সাদিকুল, এই নিষ্প্রাণ পুতুলে আবার প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। প্রাণবায়ুতে ভরপুর শিরিন, হাজী সাহেবের অবাধ্য হলে, হাজীসাহেব প্রথম স্ত্রী কুলসমের সামনে শিরিনকে তালাক দেয়। এই তালাক শিরিনের জীবনে চরম মুক্তিরই নামান্তর। সে তার অর্জিত অঙ্কের পারদর্শিতায় ও সাদিকুলের সহযোগিতায় আর্থিক স্বনির্ভর হয়ে, নিজস্ব ঘর গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ভণ্ডধার্মিক হাজী সাহেব রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারে, একমাত্র সাক্ষী প্রথম স্ত্রী কুলসমকে আগাম এক তালাক দিয়ে ভয় দেখিয়ে ও মিথ্যার আশ্রয়ে শিরিনকে আবার দখল করে। শেষপর্যন্ত শিরিনের মতো একজন প্রাণবন্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা ক্রমাগত জীবন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে, জীবনের সমস্ত শক্তি হারিয়ে সেই জাহান্নামে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকে। শুধুমাত্র সমাজজীবন বা পরিবারজীবন থেকে নয়, তার গর্ভে লালিত সন্তানের অনুভূতি থেকেও সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অসাধারণ মেধাসম্পন্ন শিরিনের মতো কতশত মুসলিম নারী যে এভাবে অকালে হারিয়ে গেছে, তার ঠিকানা নেই। মুসলিম অন্দরমহলের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন আখ্যান রচনায় আবুল বাশারের সমাজদৃষ্টি আমাদের বাকরুদ্ধ করে তোলে।

এই প্রসঙ্গে আবুল বাশারের 'ফুলবউ' (১৯৮৮) উপন্যাসটিও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এখানেও লেখক একটি বৃহত্তর পটভূমিতে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ, অসমবিবাহ, হালালা বিবাহ ও তালাককে কেন্দ্র করে অন্দরমহলে নেমে আসা মর্মান্তিক বাস্তবতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। 'এক টুকরো চিঠি' ছোটগল্পের শিরিন, বুড়ো স্বামীর কাছে ধর্ষিত হয়ে, 'জাহান্নামে'র পরাধীন জীবনযাপনে বাধ্য হলেও, 'ফুলবউ' উপন্যাসের

কিশোরী রাজিয়া কিন্তু বুড়ো স্বামী নিসার হোসেনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। নিসারের চতুর্থ স্ত্রী হতে বাধ্য হলেও, বিয়ের রাতে কামার্ত স্বামীর হাত থেকে বাঁচতে

> "বড় বউয়ের পায়ে বাসর ঘর থেকে ছিটকে আসে চৌদ্দ পনেরর একটি ভীরু যৌবন। বুবু আমাকে বাঁচাও, আমি বুড়োর কাছে শুতে পারব না। আমার ভয় করছে। বুড়োর চোখ দুটি জ্বলছে বুবু, মনে হচ্ছে মড়া। আমি পারব না। আমাকে তোমার পায়ের কাছে শুতে দাও।"[৭]

যদিও বিস্তর 'ধ্বস্তাধস্তি' পরেও কিশোরী রাজিয়াকে 'বাগে' আনতে না পারায়, নিসারের কঠিন শাস্তিতে তার কনুই পুড়ে যায়। অথচ শিক্ষিত ও সুন্দরী রাজিয়াকে, নিসারের মা একসময়, নিসারের পুত্রবধূ করার প্রস্তাব দিয়েছিল। পুত্র মিল্লাতের জন্য নির্বাচিত রাজিয়াকে বিয়ে করে নিসার হোসেন, রাজিয়ার দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে, শহরের বাড়ির বিনিময়ে। নবীসাহেবের সুন্নত পালন করার নামে নিসার হোসেনের এই ভণ্ডামি কন্যা নবীনা ও পুত্র মিল্লাত মেনে নিতে পারে না। রাজিয়া বারবার নিসারের কাছে তালাক চায়, এমনকি তালাক না দিলেও 'খালাস' অর্থাৎ ইহলৌকিক মুক্তির জন্য নিসারের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হয়। কিন্তু নিসারের কাছ থেকে অভিসম্পাত ছাড়া সে আর কিছুই পায় না। শহরের বাড়ির দখল নিয়েই রাজিয়ার সঙ্গে মিল্লাতের পরিচয়। অপরিচয়ের আঁধার কাটিয়ে পরস্পর পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী থেকে অনুরক্ত হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে আসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকার, গুরুপত্নী তারার, সন্তানসম স্বামীর শিষ্য সোমের প্রতি প্রেমে, বাঁধাহীন আকুলতার কথা। রাজিয়া ও মিল্লাত দুজনেই শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও, সতীনপুত্র মিল্লাতের সঙ্গে রাজিয়ায় পরিণয়ে বাধা হয়ে আসে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কার। ধর্মের রক্ষক আকবর মৌলবিদের ধর্মের বিধান ও কোরান হাদিসের ব্যাখ্যা, ধর্মধ্বজীদের প্রতিপত্তির কাছে হেরে যায় রিয়াজ, রাজিয়া ও মিল্লাত। 'ফুলবউ' উপন্যাসের প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল শিক্ষিত মানুষেরা শেষপর্যন্ত পরাজিত হয় সমাজ ও ধর্মের কঠোর বিধানের কাছে। তাই শেষ পর্যন্ত রাজিয়া অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

যে সমাজে সাদিক বা মবিনের মত শিক্ষিত কিন্তু গোঁড়া অমানবিক চরিত্রের মানুষেরা বাস করে, সেই সমাজে অসহায় রাজিয়ারা ধর্ষিত হতে পারে, কিন্তু কোন সম্মানীয় পরিবারের পুত্রবধূ হতে পারে না বা জীবনের স্বপ্নপূরণ করতে পারে না, এই সমাজসত্যই লেখক এখানে প্রকাশ করেছেন। নবীনার শিক্ষিত কামুক স্বামী সাদিক, অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা বা কোনো কুরূপা বিবাহের পাত্রীকে পাত্রস্থ করার জন্য, সুন্দরী রাজিয়ার সৌন্দর্যের টোপ ব্যবহার করার মত অন্যায় অমানবিক কাজ খুব সহজেই করে যেতে পারে। তাতেই এই সমাজের অন্দরমহলে আরও বেশি করে সংকট নেমে আসে। সাদিকের দ্বিতীয় বিবাহেও নবীনা মুক্তি পায় না। সাদিক নবীনাকে তালাক দিতে চায় না, নবীনার বাবার সম্পত্তি পাওয়ার লোভে। তালাক না পাওয়ায় 'পরস্ত্রী' নবীনা, ভালবাসার মানুষ রিয়াজকে বিয়ে করতে পারে না। তাই চরম মানসিক উত্তেজনায় সেও মৃত্যুর পরপারে হারিয়ে যায়। এইভাবেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কুক্ষিগত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানে বারবার রাজিয়া বা নবীনারা হেরে যায়। তাদের জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদ একসময় থেমে যেতে বাধ্য হয়। তবে সমাজঅভিজ্ঞ কথাসাহিত্যিক আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে অন্তঃপুরবাসিনীরা আলোকময় উত্তরণ খুঁজে না পেলেও, মুসলিম সমাজে ধর্মকে কেন্দ্র করে ঘটে চলা অধর্মের প্রতি তিনি যে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাপট তথা প্রচলিত ধর্মের অসঙ্গতি মুসলিম অন্দরমহলকে কতটা ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে, আবুল বাশার সেই সমাজসত্যকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

আবুল বাশারের মুসলিম অন্দরমহলের যে সমস্ত নারীর সংকট ও সমস্যাকে রূপায়িত করেছেন, তাদের অধিকাংশই কোন না কোন দিক থেকে অসাধারণ। রাবেয়া, রাজিয়া বা শিরিনের সংখ্যা এই সমাজে খুবই সীমিত। তাঁর সৃষ্ট মুসলিম চরিত্রের বেশীরভাগই শিক্ষিত কিন্তু ধর্মের মোহে অন্ধ। এই গোঁড়া শিক্ষিত অন্দরমহলে নারী যেন আরও বেশি শোষিত, বঞ্চিত, পীড়িত ও ধর্ষিত। শিক্ষিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ধর্মের ভয়কে সহজেই জয় করতে পারে বলেই, তারা ধর্মীয় বিধানের অপব্যাখ্যা করে, ধর্মের বিকৃতি ঘটায় নিজেদের স্বার্থে। তাই বুঝি আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে অন্তঃপুরবাসিনীর করুণ পরিণতি এতটা ভয়াবহ রূপে উঠে আসে। মুসলিম সমাজে অশিক্ষিত নরনারীর মনে, তালাককে কেন্দ্র করে পারলৌকিক ধর্মভয় কতটা গভীর, মহাশ্বেতা দেবীর কাছে তা হয়তো স্পষ্ট ছিল না। তাই তাঁর কুলসুম খুব সহজেই জীবনের চরম সমস্যার একটি সমাধান খুঁজে নেয়। অবশ্য অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়াটাও এখানে একটি বড় সমাধান। আবুল বাশারের নারীরা এদিক থেকে অনেকটাই পশ্চাদপদ। কারণ তিনি জানতেন মৌলবাদী, শিক্ষিত, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মুসলিম অন্দরমহলে নারীরা কতটা অসহায়। তাই হয়তো তাঁর অন্দরমহলের বাসিন্দারা বারবার হেরে যায় মৌলবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে।

তথ্যসূত্র:

১. আমেদ, আফসার। মুসলমান সমাজঃ নানাদিক, তালাকঃ উচ্চারণের রকমফের নিয়েই মুফতিদের বিরোধ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫৮।

২. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনাসমগ্র। ঊনবিংশ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ২৯৬।

৩. বাশার, আবুল। গল্পগ্রন্থ সিমার, সিমার। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৫।

৪. বাশার, আবুল। গল্পগ্রন্থ সিমার, নাস্তিক। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৯৪-৯৫।

৫. বাশার, আবুল। গল্পগ্রন্থ সিমার, এক টুকরো চিঠি। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১১১।

৬. তদেব, পৃ. ১১৩।

৭. বাশার, আবুল। ফুলবউ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, একাদশ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬১।